ব্যাংকিং আইনটি পুনর্বিবেচনা করুন

Policy Research Institute, Bangladesh. | 1

ব্যাংকিং আইনটি পুনর্বিবেচনা করুন

Thursday, May 11, 2017

By Dr. Ahsan H. Mansur

গত সোমবার মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে ‘ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধিত) আইন, ২০১৭’-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন আমাকে বেশ বিস্মিত করেছে। সংশোধিত আইনের খসড়ায় একই পরিবার থেকে চারজন পরিচালনা পর্ষদে থাকতে পারবেন। আবার একজন পরিচালককে টানা তিন মেয়াদে বা ৯ বছর পরিচালক থাকার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি, বেসরকারি ব্যাংক পরিচালনা আইনের ক্ষেত্রে এটা নজিরবিহীন। আমি আরও অবাক হয়েছি, এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুপারিশও মানা হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বলা হয়েছিল, এক পরিবার থেকে একজনের জায়গায় সর্বোচ্চ দু’জন পরিচালক থাকতে পারে। আমার আশঙ্কা, একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর খাত নিয়ে এমন সিদ্ধান্তের নেতিবাচক প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী।

আমি আরও অবাক হয়েছি, খসড়া আইনটি নিয়ে অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার বা অন্যান্য স্টেকহোল্ডার বা অংশীজনের সঙ্গে কোনো আলোচনা করা হয়নি। তাদের কোনো পরামর্শ নেওয়া হয়নি। এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শও অগ্রাহ্য করা হয়েছে। তাহলে কাদের পরামর্শে এই খসড়া আইনটি করা হয়েছে!

বিশ্বজুড়েই ব্যাংকিং খাতকে খুব স্পর্শকাতর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নানা আইন ও নিয়ম-কানুন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়। কারণ, এই খাতে কোনো অস্থিতিশীলতা দেখা দিলে গোটা আর্থিক খাতে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে। একটি দেশের আর্থিক খাত কতটা শক্তিশালী, তা নির্ভর করে ওই দেশের ব্যাংকিং খাত কতটা স্থিতিশীল, তার ওপর। কারণ একটি ব্যাংক মানে কেবল ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের বিষয় নয়। ব্যাংকে যে অর্থ আমানত রাখা হয়, তা ব্যাংকেরও নয়। আমানতের মাত্র তিন শতাংশ এর উদ্যোক্তা বা মালিকদের। বাকি ৯৭ শতাংশ অর্থ আসলে সাধারণ মানুষের।

বিশ্বের সব দেশেরই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখে। ব্যাংক পরিচালনার প্রত্যেকটি ধাপ নজরে রাখে এবং প্রয়োজনমাফিক নির্দেশনা দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নজর রাখে, কোনোভাবেই যেন ব্যাংকে অনিয়ম না হয় এবং জনসাধারণের অর্থ

ব্যাংকিং আইনটি পুনর্বিবেচনা করুন

Policy Research Institute, Bangladesh. | 2

নয়ছয় না হয়। কারণ যখন কোনো ব্যাংক সংকটে পড়ে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ আমানতদাররাই।

রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধিবিধান, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজরদারি ছাড়াও কোনো ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদকে সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হয়। যদি না হয়, তাহলে সংকট দেখা দিতে পারে। তাদের সততা ও যোগ্যতার ওপর গোটা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার গতি-প্রকৃতি নির্ভর করে। আমাদের দেশের পরিস্থিতি যদি পর্যালোচনা করি দেখা যাবে, বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গঠনে এ দুটি বিষয় খুব বেশি প্রাধান্য পায় না। পরিচালনা পর্ষদ নির্ধারিত হয় মূলত উদ্যোক্তা বা মালিকদের পছন্দের ভিত্তিতে। ব্যাংকিং খাত নিয়ে তাদের দক্ষতা বা ব্যক্তিগত বা পেশাগত সততা কতটা যাচাই করা হয়, আমার সন্দেহ রয়েছে।

প্রশ্নটা আরও গভীরে গিয়ে তোলা যায়। আমাদের দেশে বেসরকারি ব্যাংকের মালিকানা কারা পায়, কীভাবে পায়? বেশিরভাগের বেসরকারি ব্যাংকের অনুমোদন দেওয়া হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। অনেক ব্যাংকের উদ্যোক্তা বা মালিকের সরাসরি রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে। এমনকি অনেকে সক্রিয় রাজনীতিক। আদর্শ পরিস্থিতিতে ব্যাংক মালিকদের কর্তৃত্ব যত খর্ব থাকে, ব্যাংকিং খাতের জন্য তা ততই ভালো। কিন্তু আমাদের এখানে উদ্যোক্তা ও পরিচালনা পর্ষদের কর্তৃত্ব থাকে সবচেয়ে বেশি। সেই কর্তৃত্বও নতুন আইনের মাধ্যমে আরও বাড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে।

ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের দায়িত্ব যেখানে কেবল দিকনির্দেশনা দেওয়া, সেখানে আমাদের দেশে পরিচালনা পরিষদ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনাগত দিকে বেশি মনোযোগ দিতে আগ্রহী। তাদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি ঋণ কার্যক্রমে। কাকে ঋণ দেওয়া হবে, কত ঋণ দেওয়া হবে_ এগুলো যেন তাদের মূল কাজ। ফলে দেখা যায়, পরিচালকদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবই বেশি ঋণ পাচ্ছে। আবার এক ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সদস্য আরেক ব্যাংক থেকে ঋণ নেন। এটা আসলে পারস্পরিক। যেহেতু নিজের ব্যাংক থেকে নিতে পারবেন না তারা, পরস্পরের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে একে অপরের ব্যাংক থেকে ঋণ নেন। পরস্পরের পিঠ চুলকাচুলকির মতো। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার নজিরও রয়েছে আমাদের দেশে। ফলে ঋণখেলাপির সংখ্যা ও খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রতিবছর বাড়ছে, কুঋণের মাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে।

সব মিলিয়ে আমাদের দেশে যে ব্যাংকিং সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে গেছে, তা মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। গোটা আর্থিক খাতের জন্য এটা একটা দুঃসংবাদ। একটি ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যায়। আন্তর্জাতিকভাবে নামকরা বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোক্তা বা মালিকের নাম সাধারণ মানুষ জানে না। কারণ মুখ্য কেউ থাকে না। সবাই শেয়ারহোল্ডার। শেয়ারের মালিক সবারই ব্যাংক সেটা। কিন্তু বাংলাদেশে দেখা যাবে, প্রায় প্রত্যেক বেসরকারি ব্যাংকের মালিকের নাম সাধারণ মানুষ জানে। শুধু তাই নয়, সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে ‘ওই ব্যাংক অমুকের’। ব্যাংকে

ব্যাংকিং আইনটি পুনর্বিবেচনা করুন

Policy Research Institute, Bangladesh. | 3

ব্যবস্থাপক ও কর্মী নিয়োগেও অনেক ক্ষেত্রে এসব নামের প্রভাব থাকে। এটাই আমাদের ব্যাংকিং সংস্কৃতি এবং এটা বিপজ্জনক। বিদেশে ব্যাংক পরিচালনা করে সততা, যোগ্যতা ও দক্ষতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ পরিচালনা পরিষদ এবং ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বা কর্মী নিয়োগ হয় যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে।

শুধু ব্যাংকিং খাত নয়, আমাদের দেশে সত্যিকারের ‘করপোরেট কালচার’ অন্যান্য বাণিজ্যিক উদ্যোগেও গড়ে তোলা যায়নি। সেগুলোতেও রাজনৈতিক পরিচয়, পারিবারিক পরিচয়, প্রভাব- এসব কাজ করে। বরং বলা চলে, অন্যান্য খাতের চেয়ে আমাদের ব্যাংকিং খাত বেশ এগিয়ে ছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ, স্টক মার্কেটে শেয়ার ছাড়ার কারণেই এগিয়ে আমাদের ব্যাংকিং খাত। কিন্তু খসড়া আইনের মাধ্যমে সেই সম্ভাবনাটুকুও শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ব্যাংকে যতটুকু করপোরেট কালচার এখনও অবশিষ্ট আছে, সেটুকুও নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।

সংশোধিত আইনের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে কিছু পরিবারের ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এক একটি ব্যাংক হয়ে উঠতে পারে এক একটি পরিবারের তালুক। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠা করে উপমহাদেশের ভূমি ব্যবস্থা থেকে কৃষকের অধিকার বিলোপ করেছিলেন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জমিদারদের একচ্ছত্র আধিপত্য। একটি নতুন সামন্ত শ্রেণি তৈরি হয়েছিল রাতারাতি। খসড়া আইনের মাধ্যমেও যেন একই দিকে যাচ্ছে ব্যাংকিং খাত। এক একটি ব্যাংকে এক একটি পরিবারের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হবে। গড়ে উঠবে নতুন এক সামন্ত শ্রেণি। কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এ দেশের কৃষক সমাজ অধিকার হারিয়েছিল; নতুন খসড়ায় এ দেশের সাধারণ আমানতদার ও সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার হারাতে চলছে।

হলমার্ক কেলেঙ্কারি, বেসিক ব্যাংক কেলেঙ্কারিসহ ব্যাংকিং খাতের বেশ কয়েকটি বহুল আলোচিত কেলেঙ্কারির জন্য ইতিমধ্যে আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থা নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। অনেক ব্যবসায়ী গ্রুপ ঋণ নিয়ে আর পরিশোধের নাম করছে না। ফলে কোনো কোনো ব্যাংকের মূলধনে টানাপড়েন দেখা দিয়েছে। বড় অনেক ঋণখেলাপি কিছু ব্যাংকের পরিচালক পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এ ধরনের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার কারণে ঋণের মান কমে যাচ্ছে। আর এসবের দায় বহন করছে সাধারণ মানুষ।

মনে রাখতে হবে_ দুর্নীতি ও অনিয়ম তো বটেই; অদক্ষতারও ব্যয় রয়েছে। ব্যাংকিং খাতে এই অনিয়ম ও অদক্ষতার দায় কে বহন করে? নিঃসন্দেহে সাধারণ মানুষ, যারা ওইসব ব্যাংকে লেনদেন করেন, আমানত রাখেন। খসড়া আইনটি যদি বহাল হয়, সাধারণ মানুষের বঞ্চনা আরও বাড়বে।

ব্যাংকিং আইনটি পুনর্বিবেচনা করুন

Policy Research Institute, Bangladesh. | 4

আমরা জানি, একটি দেশের আর্থিক খাতকে টিকিয়ে রাখে তিনটি খাত- ব্যাংকিং, স্টক মার্কেট, বন্ড মার্কেট। বাংলাদেশের বন্ড মার্কেট নেই বললেই চলে। স্টক মার্কেট চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। শক্তিশালী ছিল একমাত্র ব্যাংকিং খাত। সেটাকেও এখন যেন রুগ্ণ করার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অপচেষ্টা চলছে।

আমি মনে করি, সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নয়নের ধারায় চলছে। প্রবৃদ্ধির হার বাড়ছে। আমাদের লক্ষ্যও অনেক উঁচুতে। ইতিমধ্যে আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি; উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে চাই। এ ক্ষেত্রে আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। কিন্তু ব্যাংকিং খাতে অস্থিতিশীলতা বাড়িয়ে সেটা সম্ভব হবে না।

আমি মনে করি, এখনও সময় আছে। খসড়া আইনটি মাত্র মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে, এখনও সংসদে পাস হয়নি। সরকারের উচিত হবে, ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের স্টেকহোল্ডার বা অংশীজনের সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা করা। তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা। এরপর পুনরায় সংশোধন করে মন্ত্রিসভায় তোলা এবং সংসদে পাস করা। তাতে করে সবারই মঙ্গল হবে। কাজটি সহজ না হলেও কঠিন নয়। অসম্ভব তো নয়ই। দেশের ও জনসাধারণের কল্যাণে সবই করা সম্ভব ও উচিত।